বিদর্শন-যোগ

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Bipasshi Bhante

Courtesy by Dr. GyanaRatna MahaThera

বিদর্শন-যোগ

(বৌদ্ধধ্যানপদ্ধতি)

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদ সচিব ও কলিকাতা সংস্কৃত
কলেজের
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী
মহোদয় লিখিত মুখবন্ধ সংবলিত

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন
সোনাঝুরিপল্লী, শান্তিনিকেতন,
গোয়ালপাড়া রোড, বীরভূম

VIDARSHAN-YOG
by SHILANANDA BRAHMACHARI

Second Edition : Prabarana Purnima, 22 September, 2010

Published by :
Ven. Binaysree Bhikkhu (Mahasthavir)
General Secretary
Santiniketan Ambedkar Buddhist Welfare Mission
Sanajuri pally, Buddhist Temple, Prantik,
Santiniketan, Birbhum

Available at :
Bauddha Dharmankur Sabha
1, Buddhist Temple Street
Kolkata-700 012

Vidarshan Shiksha Kendra
50T/1C, Pandit Dharmadhar Sarani (Pottery Road)
Kolkata-700 015

Printed by : New Gita Printers
51, Jhamapukur Lane, Kolkata-9

শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০ (ত্রিশ টাকা মাত্র)

শ্রীযুক্ত রণধীর বড়ুয়া --- শ্রীমতি কল্পনা বড়ুয়া

নিবেদন

শ্রীযুক্ত রণধীর বড়ুয়া ও শ্রীমতি কল্পনা বড়ুয়ার
নীরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি।

আশীর্বাদ প্রার্থী

শ্রী কিরণচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রী অরুণ বড়ুয়া ও শ্রী তরুণ বড়ুয়া
পাঁচলোকী (বড়ুয়াপাড়া), মোড় পুকুর, রিষড়া, হুগলী, পঃ বঃ
(পূর্বনিবাস ঃ বঙ্গ জোয়ারা, পটিয়া, চন্দ্রনাইস, চট্টগ্রাম)

গ্রন্থটি শ্রী কিরণচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রী অরুণ বড়ুয়া ও শ্রী তরুণ বড়ুয়ার
অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।

মুখবন্ধ

অঙ্গুত্তর নিকায়ের অট্‌ঠক নিপাতে একটি সূত্রে বলা হয়েছে[১] — মহাসমুদ্রের জল যেমন কেবল লবণাক্ত, তেমনি এ ধর্মবিনয়ও কেবল বিমুক্তিরসসিক্ত। বলা বাহুল্য, অন্তর শুদ্ধ শান্ত না হলে বিমুক্তিরস আস্বাদন করা যায় না। বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বে স্বীকার করা হয়েছে — চিত্ত নির্মল ভাস্বর, তা আগন্তুক উপক্লেশের দ্বারাই উপক্লিষ্ট হয়। এ উপক্লেশ হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। এগুলো যখন চিত্তকে অভিভূত করে, তখনি চিত্ত স্বাভাবিক নির্মলতা হারিয়ে ক্লিষ্ট হয়। ক্লিষ্ট চিত্ত আপনার বিকলভাবের জন্য অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাই ধর্মপদে বলা হয়েছে—

বারিজোর থলে খিত্তো ওকমোকত উব্‌ভতো
পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।[২]

জলাশয় থেকে উদ্ধৃত মৎস্য যেমনি স্থল ত্যাগ করে জলে পড়বার জন্য ছট্‌পট্‌ করে, তেমনি চিত্ত মাররাজ্য পরিত্যাগের জন্য ছট্‌পট্‌ করে। অর্থাৎ আনন্দ ও শান্তির গোপন পিপাসায় চিত্ত উপক্লেশমুক্ত হয়ে আপনার স্বাভাবিক নির্মল অবস্থা ফিরে পেতে চায়। কিন্তু তা ফিরে পাওয়া বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের মত সহজ নয়। ধৈর্য ও পরাক্রম নিয়ে তা আয়ত্ত করতে হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এজন্য রয়েছে

১। সেয্যথাপি পহারাদ মহাসমুদ্দো একরসো লোণরসো, এবমেব পহারাদ অযং ধম্মবিনয়ো একরসো 'বিমুত্তিরসো।' পহারাদ সুত্তং, অট্‌ঠক নিপাত, অঙ্গুত্তর নিকায়।

২। চিত্ত বগ্‌গ, ধম্মপদ।

শীলসাধনা ও সমাধিভাবনার নির্দেশ। শীলের দ্বারা কায়বাক সংযমে চারিত্রিক শুচিতা লাভ হয় এবং সমাধি ভাবনার দ্বারা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনে চিত্তকে বিমুক্তিরসাস্বাদনের অনুকূল করা হয়। বৌদ্ধ ভাবনার শমথ ও বিদর্শন এ দুই ভাগের মধ্যে বিদর্শন ভাগই এ পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রন্থকার প্রীতিভাজন শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মূলশাস্ত্র গ্রন্থ ও টীকাদিতে সম্যক্ অধীতী। অধিকন্তু তিনি সিংহল ও ব্রহ্মদেশের সিদ্ধ বৌদ্ধযোগীদের সান্নিধ্যলাভে বৌদ্ধ ভাবনার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন। সাধনার দুরূহ জটিল বিষয় তাঁর লেখনীতে সহজ সরল হয়ে উঠেছে। তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন বিদর্শন সাধনার স্তরগুলো। অল্প পরিসরের মধ্যে বিষয় সুপরিস্ফুট হয়েছে। পরিশেষে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য—

> "এ স্তরে উপনীত যোগী হন বন্ধনহীন শুদ্ধ মুক্ত পুরুষ। তাঁর নির্বাণোপলব্ধি হয় পরিপূর্ণ। এ অবস্থাই বিদর্শন যোগীর চরম লক্ষ্য, সাধনার শেষ, কর্তব্যের অবসান— নত্থি উত্তরি করণীয়ং।"

বাঙলার তত্ত্বজিজ্ঞাসু তথ্যসংগ্রাহক ও সাহিত্যরসিক পাঠক মাত্রেই এ পুস্তিকা পাঠে পরিতৃপ্ত হবেন। বিশেষভাবে যাঁরা বিদর্শন সাধনায় রত হতে চান, তাঁদের পক্ষে এ পুস্তিকাটি এক অমূল্য সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইতি—

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্
কলিকাতা
৩রা ফাল্গুন, ১৩৬৭ সাল।

শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

পুনর্মুদ্রণের প্রাক্‌কথা

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির কল্যাণে মানুষ ভোগসম্পদে মহাসমৃদ্ধ। কিন্তু এই মহাসমৃদ্ধিময় বিশ্বে আত্মকর্তৃত্বহীন মানুষ আজ একান্ত কৃপার পাত্র। তাই বুদ্ধ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন তার অশান্ত অনিয়ন্ত্রিত মনকে শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করতে। কেননা মানুষের নিজের মন শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত না হলে তার জীবনই বৃথা। তাই বুদ্ধ বলেছেন আত্মজয়ের কথা—

যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে
একঞ্চ জেয্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো। *(ধর্মপদ, গাথা ১০৩)*

কবিতায় যার অনুবাদ এরকম—

পেয়েছেন যিনি জয়গৌরব, জিনি সহস্র সৈন্য
তার চেয়ে শ্রেয় একটি মানুষ
যিনি জিতেছেন আত্মকলুষ
তিনিই যোদ্ধা ধন্য।

সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই আমাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ সার্থক আর ফলপ্রসু হয়ে ওঠে। প্রগলভতা আর মূর্খতা সমার্থক। তাই সামান্যতম অর্থবহ কথাও আলোর কণিকার মত অনেক অন্ধকার, অনেক অজ্ঞতা দূর করতে পারে। কিন্তু অযথা কথা যত উচ্চারিত হয় ততই তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে মনকে। শত্রু চোখের সামনে আছে, তাকে বিধ্বস্থ করা হয়তো কঠিন নয়। কিন্তু অদৃশ্য থেকে যে আঘাত হানে তার সঙ্গে যুদ্ধে জেতা কঠিন। মানুষের নিজের মনের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন আর দুর্গম জায়গা আর কোথায় আছে? সেই অন্ধকারের আড়াল থেকে যে প্রবল শত্রু আঘাতে আঘাতে মানুষকে জর্জরিত করছে তাকে পরাজিত করে যিনি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন তিনিই প্রকৃত জয়ী। অন্য শত্রু তার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু বাইরের হাজার শত্রুকে জয় করেও নিজের মনকে যিনি স্ববশে আনতে পারেননি, তার জয়গৌরব সামান্যই।

নিজের চিত্তকে স্ববশে আনার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন ভারতে গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্ট জন্মেরও বহু বছর আগে। সেই উপায় হল শমথ ও বিপশ্যনা (বিদর্শন) ভাবনা। বিদর্শনে হয় আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিমুক্তি। বিকারমুক্ত চিত্তে মৈত্রী আর করুণার ধারা অনায়াসে ঝরতে থাকে। তাই বিদর্শনসাধনায় সিদ্ধিতেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। এই সিদ্ধিলাভ অবশ্যই কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। অদম্য উৎসাহের সঙ্গে বিদর্শনের মঙ্গলপথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এক বা একাধিক বিদর্শন শিবিরে যোগ দিলেই সব কিছু হবে না। এটি আজীবন প্রতিনিয়ত চর্চার বিষয়। তবে যিনি ধ্যানসমাধিতে

অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তেমন উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকেই সরাসরি শমথ বা বিপশ্যনা শিক্ষা গ্রহণ বিধেয়।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (১৯০৭-২০০২) বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চায় বাঙালি সারস্বত সমাজে এক সুপরিচিত নাম। তিনি শুধু শাস্ত্রচর্চা বা গ্রন্থ রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি, বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ বিনির্মাণেও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বাঙালি বৌদ্ধদের শতাব্দী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। পঞ্চাশের দশকে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার নবরূপকার সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের (১৯২৫-২০০৯) যখন কর্মযোগী কৃপাশরণ (১৮৬৫-১৯২৬) প্রবর্তিত জগজ্জ্যোতি পত্রিকা নবপর্যায়ে প্রকাশনার কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন, তখন তিনি সাহিত্যিক শীলানন্দ ব্রহ্মচারীকে সামিল করে জগজ্জ্যোতি সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। দীর্ঘকাল তিনি ধ্যানসমাধিচর্চায় রত ছিলেন, লিখেছেন অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক-পুস্তিকা। যার মধ্যে 'বিদর্শন-যোগ' অন্যতম। এ পুস্তিকাটি ১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়ে পাঠকনন্দিত হয় এবং স্বল্প সময়ে এর সব কপি নিঃশেষিত হয়। কয়েক বছর আগে আমরা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার পক্ষ থেকে কলকাতা বইমেলায় স্টল দিয়েছিলাম। সে-সময় অনেক বাঙালি পাঠক বিদর্শন ধ্যান সম্পর্কে বই ক্রয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। বর্তমান প্রজন্মের অনেক তরুণ-তরুণীও ধ্যান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। এই প্রেক্ষাপটে বইটির পুনর্মুদ্রণে এগিয়ে এসেছেন শান্তিনিকেতনে প্রথম বৌদ্ধ বিহারের নির্মাতা শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশন এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ভদন্ত বিনয়শ্রী ভিক্ষু। তিনি শুধু রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য শান্তিনিকেতনে প্রথম বৌদ্ধ বিহারের নির্মাতা নন, বিদর্শন ভাবনাচার্য ভবানন্দ মহাস্থবির (১৯০৬-২০০৬) এরও শিষ্য। এই পুস্তিকাটি পুনঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি যথার্থই গুরুর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এজন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি বিদর্শন ভাবনায় উৎসাহীরা এই পুস্তিকা পাঠে প্রভূত উপকৃত হবেন এবং ভদন্ত বিনয়শ্রী ভিক্ষুর ধর্মদানের এই প্রয়াস সার্থক হবে।

হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী
সম্পাদক : বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা
সহ সভাপতি : মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া
সম্পাদক : জগজ্জ্যোতি। দি মহাবোধি।
বোধিভারতী

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০
অনাগারিক ধর্মপাল জন্মদিবস

বিদর্শন-যোগ

(বৌদ্ধ ধ্যানপদ্ধতি)

এক

প্রার্থিত যশ-সম্মান সুখ-সৌভাগ্য লাভে মানুষ উল্লসিত হয় বটে, কিন্তু তৃপ্ত হতে পারে না। অতৃপ্তির হাহাকারের মধ্যে জীবনের গোণা দিনগুলি যখন ফরিয়ে যায়, তখন স্বপ্নের মত শূন্যে মিলিয়ে যায় সে যশ-সম্মান সুখ-সৌভাগ্য। চিন্তাশীল মানবের উদ্বুদ্ধ দৃষ্টিতে এ সমস্তই অসার অলীক বলে প্রতিভাত হয়। তাই তিনি ক্ষয়িষ্ণু অস্থায়ী বস্তুর জন্য চঞ্চল না হয়ে খোঁজেন জীবনের সার সত্যকে। তাঁর কাছে জীবন অর্থহীন প্রলাপ নয়। এতাদৃশ সন্ধানী সকল যুগে সকল দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। বুদ্ধযুগে এতাদৃশ বহু সন্ধানীর ইতিবৃত্ত বৌদ্ধশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাঁরা ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শে মুগ্ধ হয়ে সত্যের সন্ধানে তাঁর চরণাশ্রয় করেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে যে সাধনাপদ্ধতি অনুসরণ করে সত্যোপলব্ধি করেছিলেন, সে উজ্জ্বল সাধনার ধারা বুদ্ধোত্তর যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সন্ধানীরা অনুসরণ করতে থাকেন। এখনও তা বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ যোগীদের জীবনে জীবন্ত হয়ে আছে। এ বিশিষ্ট সাধনাপদ্ধতি বৌদ্ধ সাধনা নামে অভিহিত এবং শমথ ও বিদর্শন ভাবনা নামে কথিত দুভাগে বিভক্ত। বৌদ্ধ সাধনার বিদর্শন বিভাগই এ নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

নামরূপ বলে উক্ত ভৌতিক কায় ও মন ইত্যাদির সূক্ষ্মতম পর্যবেক্ষণে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিই বিদর্শন সাধনার লক্ষ্য। এজন্য একে বলা হয় লোকোত্তর সাধনা। পতিত জমি কর্ষণ করে সোনার ফসল ফলাবার জন্য যেমন প্রথমতঃ আগাছা তুলে ফেলতে হয়, তেমনি বিদর্শন সাধনায় সত্যোপলব্ধির ফসল ফলাতে হলে প্রথমতঃ চাই চরিত্র শোধন। শীলবিশুদ্ধি চরিত্র শোধনেরই নামান্তর। শীল গৃহী ও সংসারত্যাগীর চারিত্রিক বিধি অনুসারে প্রধানতঃ দু-প্রকার—গৃহিশীল ও ভিক্ষুশীল।

চারিত্রিক শুচিতার জন্য প্রথমতঃ গৃহীকে পঞ্চশীল নামে কথিত পাঁচ প্রকার বিরতি অভ্যাস করতে হয়। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, অসত্য ভাষণ এবং মাদকদ্রব্য-সেবন এ পাঁচ প্রকার অসদাচার থেকে বিরত হয়ে সদ্ভাবে থাকতে হয়। একেই বলে পঞ্চশীল পালন। উত্তরোত্তর চারিত্রিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে গৃহীর অষ্টশীল ও দশশীল পালনের বিধি আছে। ভিক্ষুদের জন্য প্রবর্তিত ২২৭টি নিয়ম ভিক্ষুশীল বা প্রাতিমোক্ষশীল বলে কথিত হয়। এগুলো ভিক্ষুর প্রতিপাল্য। ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু এ শীল রক্ষা করে চারিত্রিক শুদ্ধি লাভ করেন।

বস্তুতঃ কায়িক ও বাচনিক সংযমই শীল। শীল পালনে যখন কায়িক ও বাচনিক সংযম পূর্ণতা লাভ করে, তখন চরিত্র হয়ে ওঠে শুদ্ধ নির্মল। চারিত্রিক নির্মলতা মনকে আনন্দোজ্বল করে এবং মনের গতিকে সহজ সরল করে। এ সহজভাব বা সারল্যই অধ্যাত্ম-সাধনার প্রথম সোপান। মনের বক্রভাব বিদূরিত না হলে মন অধ্যাত্ম-সাধনার দ্বার খুঁজে পায় না। তাই শীল পালনে মনের বক্র ভাব বিদূরিত করে মনকে সহজ সুন্দর করে তুলতে হবে।

এতাদৃশ মন নিয়ে বিদর্শন সাধনা শুরু করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে নামরূপ পর্যবেক্ষণের কথা। যে নামরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে আবশ্যক। নাম বলতে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ চারি স্কন্ধ এবং রূপ বলতে রূপস্কন্ধকেই বোঝায়। স্কন্ধ শব্দের অর্থ হল রাশি বা সমষ্টি। পঞ্চ স্কন্ধের সমবায়ে আমাদের অস্তিত্ব বা জীবন-প্রবাহ প্রবর্তিত। এর বিশ্লেষণে আসে রূপরাশি, বেদনারাশি, সংজ্ঞারাশি, সংস্কাররাশি ও বিজ্ঞানরাশি।

রূপ — ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এ চারি-ভূত এবং এগুলোর সমবায়ে সংযোগে উৎপন্ন বস্তুকে সাধারণতঃ রূপ বলা হয়। আকাশ বা ব্যোম ভূত বা সৃষ্ট নয় বলে বৌদ্ধ দর্শনে ভূত বলে স্বীকৃত হয়নি। এজন্য পঞ্চভূতের স্থলে চতুর্ভূতই উক্ত হয়েছে।

চারি ভূতকে বলা হয় ভূতরূপ। এগুলো রূপের উপাদান, এদের সংযোগে সৃষ্ট হয় রূপ-জগৎ। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়কে বলা হয় প্রসাদ রূপ। এগুলো বস্তুতঃ রূপের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শকে বলা হয় গোচর রূপ বা বিষয় রূপ, স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব ভাব রূপ নামে অভিহিত হয়। হৃদয়ের আধারকে হৃদয় রূপ বলা হয়। জীবদেহে প্রাণ সঞ্চার করে যে রূপ প্রবর্তিত হয়, তাকে জীবনেন্দ্রিয় রূপ বলে। আহার্যই আহার রূপ। স্বভাব ও লক্ষণ ভেদে এ আঠার প্রকার রূপ নিষ্পন্ন রূপ, রূপ-রূপ ও সংমর্শন রূপ নামে অভিহিত হয়। আকাশ রূপকে সীমিত করে বলে পরিচ্ছেদ রূপ নামে উক্ত হয়। শারীরিক অভিব্যক্তি ও বাচনিক অভিব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি রূপ বলা হয়। রূপের লঘুত্ব মৃদুত্ব কর্মণ্যতা এবং বিজ্ঞপ্তিদ্বয়কে বিকার

রূপ বলা হয়। রূপের উপচয় বা অভিবৃদ্ধি, ব্যাপ্তি, ক্ষয়, বিনাশকে লক্ষণ রূপ বলা হয়। শেষোক্ত আকাশ ইত্যাদিকে নিয়ে রূপ মোটামুটি আটাশ প্রকার।

বেদনা — চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত রূপ শব্দাদি বিষয় সমূহের রসানুভূতিই বেদনা। এ অনুভূতি সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা বা সাম্য, সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য ভেদে পাঁচ প্রকার। বলা বাহুল্য, এখানে মনকে মনেন্দ্রিয় রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বিষয় বা অবলম্বন সংযোগে যে অনুভূতির উদয় হয়, তাকেই বেদনা বলা হয়। এ যখন কায়িক সুখ-সিক্ত হয়, তখন একে বলা হয় সুখবেদনা। যখন মানসিক সুখযুক্ত হয় তখন একে বলা হয় সৌমনস্য বেদনা। তেমনি কায়িক দুঃখানুভূতি দুঃখ বেদনা এবং মানসিক দুঃখানুভূতি দৌর্মনস্য বেদনা। অনুভূতি যখন সুখ-দুঃখের পর্যায় অতিক্রম করে সাম্যে স্থিত হয়, তখন একে বলা হয় উপেক্ষা বেদনা।

সংজ্ঞা — ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই, সে বিষয় সম্বন্ধে যে প্রথম প্রতীতি জাগে, তাকেই সংজ্ঞা বলে। তাই টীকায় বলা হয়েছে—নীলাদি ভেদং আরম্মণং সঞ্জানাতি, সঞং কত্বা জানাতীতি সঞ্ঞা, সা সঞ্জানন লক্খণা। সংজ্ঞা দ্বারা গোচরীভূত বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় মাত্রই হয় এবং বিষয়ান্তরের মধ্যে পার্থক্যবোধ করা যায়।

সংস্কার — বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত যাবতীয় চিত্তবৃত্তিকে সংস্কার বলে। মোহ, হ্রীহীনতা বা পাপে অলজ্জা অনপত্রপা বা পাপের প্রতি ভয়হীনত্য, ঔদ্ধত্য, লোভ, মিথ্যাদৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য বা অনুতাপ, স্ত্যান বা মানসিক আলস্য,

মিদ্ধ বা জড়তা, সংশয় এগুলোকে বলা হয় অকুশল বা অশুভ সংস্কার। শ্রদ্ধা স্মৃতি, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, করুণা, মুদিতা ইত্যাদি শোভন সংস্কার।

বিজ্ঞান — চিত্ত বা মনকে বিজ্ঞান বলে। যে চিত্ত নিয়ে জন্ম লাভ হয়, সেই প্রতিসন্ধি চিত্তের পরেই যে চিত্ত মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বা চ্যুতিচিত্তের পূর্বকাল পর্যন্ত প্রবর্তিত থাকে, তাকে বলা হয় ভবাঙ্গ চিত্ত। এ চিত্ত-প্রবাহ স্বভাবতঃ নির্মল ভাস্বর। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয় বা আলম্বন সংযোগে নিরন্তর এ চিত্ত-প্রবাহ ছিন্ন করে এক একটি চিত্তের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হচ্ছে। একে নদী প্রবাহে তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে। নদীর প্রবাহে যেমন একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়ে ক্ষণকাল স্থিত হয় এবং ভেঙে যায়, পর মুহূর্তে আর একটি তরঙ্গ তার অনুসরণ করে, ঠিক তেমনি ভবাঙ্গ-প্রবাহ ছিন্ন করে নিরন্তর একটির পর একটি চিত্তের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের খেলা চলে। এ চিত্ত সমূহকে বলা হয় বিজ্ঞানস্কন্ধ বা চিত্তরাশি।

প্রত্যেক চিত্তোৎপত্তিতে থাকে স্পর্শ, বেদনা বা অনুভূতি, সংজ্ঞা বা প্রতীতি, চেতনা, একাগ্রতা, জীবনেন্দ্রিয় বা প্রাণশক্তি ও মনস্কার। এ চিত্তবৃত্তিগুলো শোভন অশোভন সকল চিত্তোৎপত্তিতে বিদ্যমান। এজন্য এগুলো সর্বচিত্ত-সাধারণ চৈতসিক নামে অভিহিত। লোভ, মিথ্যাদৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ইত্যাদি অশুভ সংস্কার নিয়ে যখন চিত্তোৎপত্তি হয়, তখন চিত্তোৎপত্তি হয় আবিল পঙ্কিল। তাই এতাদৃশ চিত্তকে বলা হয় অকুশল বা অশোভন চিত্ত। আবার যখন শ্রদ্ধা, অলোভ, অদ্বেষ, করুণা, মুদিতা ইত্যাদি শুভ সংস্কার সমূহ চিত্তোপত্তিকে অনাবিল নির্মল করে, তখন চিত্তকে বলা হয় কুশল বা শোভন চিত্ত।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ছয় ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রকট নামরূপ বা পঞ্চস্কন্ধের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণই বিদর্শন। প্রথমমতঃ ছয়দ্বারে নামরূপের পর্যবেক্ষণই বিদর্শন। প্রথমতঃ ছয় দ্বারে নামরূপের পর্যবেক্ষণ সহজ হয় না। এজন্য কায় বা শরীরে যে স্পর্শ অনুভূত হয়, তাকে অনুসরণ করে অনুভূত রূপ লক্ষ্য করতে হবে। আমাদের গমনে স্থিতিতে উপবেশনে শয়নে প্রত্যেক অবস্থায় দেহের মধ্যে স্পর্শের সঞ্চার হয়। সেই স্পর্শের ওপর মন নিবদ্ধ করে যোগী সকল শারীরিক ক্রিয়া অনুধাবন করেন। গমনকালে পদ উত্তোলনে পদ উত্তোলিত হচ্ছে, পদ স্থাপনে পদ স্থাপিত হচ্ছে—এ ভাবে প্রতিপদের উত্তোলন ও স্থাপন ক্রিয়ায় মন নিবদ্ধ রাখেন। আহারের সময় গ্রাস গ্রহণে গ্রাস গ্রহণ করা হচ্ছে, গ্রাস মুখে নিক্ষেপনে গ্রাস মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, চর্বনে চর্বণ করা হচ্ছে, গলাধঃকরণে গলাধঃকরণ করা হচ্ছে—এভাবে যোগী আহারের প্রতিক্রিয়ায় মনঃসংযোগ করেন। তেমনি সকল শারীরিক ক্রিয়াকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করেন। বাইরের সকল বিষয় থেকে মনকে গুটিয়ে এনে এভাবে ভৌতিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণে যখন নিবদ্ধ রাখা হয়, তখন মন ক্রমশঃ সমাহিত হতে থাকে। কিন্তু একাগ্রতার পারিপাট্যের অভাবে ভৌতিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবার সময়েই কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুসমূহ মনে আত্মপ্রকাশ করে, সুখ দুঃখের অনুভূতি জাগে এবং মনের ভাব বিবর্তন হয়। তখন অবহিত চিত্তে এগুলোকে অন্তর থেকে বিদূরিত করে ভৌতিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণে রত হতে হবে। তাঁর মনে রাখতে হবে রূপপরিগ্রহ বা ভৌতিক ক্রিয়া নিরীক্ষণই তাঁর কর্তব্য।

এভাবে সাধনার অনুশীলনে উত্তরোত্তর মনের একাগ্রতা বর্ধিত

হয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মন শুদ্ধ আত্মস্থ না হয়, ততদিন পর্যন্ত সাধনার অন্তরালে রিপুসমূহ সময় সময় মনকে অধিকার করে বসে। এ অবস্থায় সাধক কখনও কখনও আত্মসচেতন হয়ে মনের ভাবসমূহ সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং কখনও কখনও বিলম্বে বুঝতে পারেন। তাঁর ক্ষণিক সমাধি অতি নবীন ও দুর্বল বলে সাধনাচিত্তকে অভিভূত করে রিপুসমূহ মনে উদিত হয় এবং সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এজন্য এগুলোকে চিত্তের নীবরণ বা পরিপন্থী বলা হয়।

ক্রমাগত সাধনায় চিত্তের একাগ্রতা যখন পূর্ণতা লাভ করে এবং ক্ষণিক সমাধি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সাধনার বিষয়কে অবলম্বন করে চিত্ত পূর্ণভাবে সমাহিত হয়। এ অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য প্রায় থাকে না অর্থাৎ মনে কাম ক্রোধ ইত্যাদির উদয় বিরল হয়। যদিও কখনো কখনো ব্যতিক্রম ঘটে, চাঞ্চল্য সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই যোগী যথাযথভাবে তা লক্ষ্য করতে পারেন। এ ভাবে আত্মাবহিত হবার ফলে রিপুসমূহ মনে স্থান খুঁজে পায় না এবং স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁর মন শুভ্র নির্মল হয়ে ওঠে। এরকম মন সাধনার বিষয় অবলম্বন করে সহজেই সমাহিত হয়। এ সমাহিত ভাবকে বলা হয় বিদর্শন চিত্তের ক্ষণস্থিতি। এ সমাধি নিরন্তর প্রবর্তিত হতে থাকে। একেই বলে চিত্তবিশুদ্ধি। এর স্থিতিকাল পরিমিত হলেও সাধনার বিষয়ে নিরন্তর একভাবে প্রবর্তিত হওয়ায় রিপুসমূহ সাধকের মনকে অভিভূত করতে পারেনা এবং তা সুদৃঢ় ও নিশ্চল হয়।

প্রথমতঃ ছয় দ্বারে প্রকট নামরূপের বিদর্শন সহজসাধ্য নয় বলে শুধু কায়দ্বারে স্পর্শানুসরণে অনুভূত রূপকে কেন্দ্র করে বিদর্শন সাধনা আরম্ভ করার কথা বলা হয়েছে। এতে যখন যোগী

পূর্বোক্তভাবে অধিকার লাভ করেন, তখন তিনি একটির পর একটি করে অন্যান্য শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকট নামরূপের প্রকৃতি মননে রত হন এবং সহজেই তাতে সাফল্য অর্জন করেন। তখন তাঁর ক্ষণিক সমাধি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

দুই

এভাবে পূর্বোক্ত চিত্তবিশুদ্ধি যখন আয়ত্ত হয়, তখন যোগী নামরূপকে বিশ্লেষণ করেন। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ চারি স্কন্ধকে বলা হয় নাম এবং ভৌতিক রূপস্কন্ধকে বলা হয় রূপ। এ দুটির অর্থাৎ নাম ও রূপের সমবায়ে আমাদের অস্তিত্ব বা জীবন প্রবাহ-প্রবর্তিত। স্বাভাবিকভাবে বেদনাদি চারি স্কন্দ রূপস্কন্ধের দিকে নমিত হয় বলে এদের বলা হয় নাম। নাম বস্তুতঃ রূপকে আশ্রয় করে আপন আপন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু নাম ব্যতীত রূপ অচেতন জড় বস্তু মাত্র। অতএব এরা পরস্পরাশ্রিত। আবার নাম বলে উক্ত চারি স্কন্ধের মধ্যে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার বিজ্ঞান বা চিত্ত ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন আলো ও উত্তাপ সূর্যের সহজাত। তেমনি এরাও পরস্পর সহজাত। একটির উৎপত্তিতে অপরটির উৎপত্তি এবং একটির বিলয়ে অপরটির বিলয় ঘটে।

ছয় ইন্দ্রিয় পঞ্চস্কন্ধের দ্বারস্বরূপ। বর্ণ, শব্দ, গন্ধ, রসাদি বিষয়সমূহের স্পর্শে ছয় ইন্দ্রিয় অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। স্থূলদৃষ্টিতে নামরূপের স্বরূপ প্রতিভাত না হলেও এগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে শুধু ধর্মরাশির বা পঞ্চস্কন্ধের ক্রিয়াভিনয় স্পষ্ট হয়। যেমন তরীকে আশ্রয় করে মানুষ সমুদ্রযাত্রা করে, তেমনি রূপ আশ্রয় করে নামকায় প্রবর্তিত হয়। মানুষের

সাহায্যে তরী যেমন সমুদ্রে পরিচালিত হয়, তেমন নামের সাহায্যে রূপকায় পরিচালিত হয়। নামরূপের এ ক্রিয়াভিনয়ের মধ্যে কোথাও ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অক্ষ চক্র ইত্যাদির সমবায়ে যেমন রথ আকার গ্রহণ করে, তেমনি নাম ও রূপের সমবায়ে ব্যবহারিকভাবে 'ব্যক্তি' প্রকাশ পায়। নামরূপের বিশ্লেষণে যোগীর প্রতিভাত হয়—গমন-স্থিতি উপবেশন-শয়ন উন্নমন-অবনমন ইত্যাদি ভৌতিক ক্রিয়াসমূহ বিভিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানও এক নয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে একাগ্র মনে সমগ্র নামরূপের ক্রিয়াবলীর বিশ্লেষণ চলতে থাকে।

গোড়াতে যোগাভ্যাসের সময় শারীরিক ক্রিয়া অনুধাবনে 'আমি পদোত্তোলন করছি' 'আমি পদ স্থাপন করছি' 'আমি আহার করছি' 'আমি উন্নমিত হচ্ছি' 'আমি আনত হচ্ছি' 'আমি পর্যবেক্ষণ করছি' এ ভাবে সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে অজ্ঞাতসারে 'আমি' 'আমার' ধারণা বা অহংভাব জাগ্রত থাকত। সমাহিত চিত্তে নামরূপ বিশ্লেষণের ফলে এ অহংভাব অপগত হয়ে তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় শুধু নামরূপের অনবচ্ছিন্ন লীলা যাতে পুদ্গল নেই ব্যক্তি নেই। তখন দৃশ্য বস্তু দর্শনে তিনি অনুভব করেন—চক্ষু, দৃশ্যবস্তু, দর্শন এবং অবগতি বিভিন্ন। শব্দ শ্রবণে কর্ণ, শব্দ শ্রবণ এবং অবগতিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করেন। এভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদিতেও বিশ্লেষণ জ্ঞান হয়। এ সময় নাম বলে উক্ত চিত্ত ও চিত্তবৃত্তিসমূহের বিষয়াভিমুখে গমন ও নতি এবং রূপ বলে কথিত ভৌতিক বস্তুসমূহের বিষয়াভিমুখে অগমন তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিশ্লেষণ করে হৃদয়ঙ্গম করেন। একেই বলে নামরূপ বিশ্লেষণ জ্ঞান। এ জ্ঞান পরিপক্ক হলে যোগীর বোধ জাগে—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষণে শরীরের যে উন্নমন অবনমন হয়,

তা এবং তার সম্বন্ধে জ্ঞান এ দুটি ব্যতীত এতে অন্য কিছু নেই। এভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ভৌতিক ক্রিয়া ও তার সম্বন্ধে জ্ঞান এ দুটিকে আশ্রয় করে 'আমি' 'তুমি' 'সে' স্ত্রী পুরুষ বলে কোন ব্যক্তি বিশেষের ধারণা জাগে না। তিনি নামরূপের সমস্ত ক্রিয়ায় শুধু নামরূপকেই দেখেন। একেই বলে দৃষ্টি-বিশুদ্ধি।

দৃষ্টি বিশুদ্ধি যখন পরিপক্ক হয়, তখন নামরূপের হেতু বা কারণ জানা যায়। প্রথমতঃ চিত্তই রূপের হেতু বলে প্রকাশ পায়। কারণ, হস্ত-পদ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে চিত্তই কর্তৃত্ব করে। সুতরাং চিত্তকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের হেতু বলে মনে হয়। যোগী প্রথমতঃ এগুলো পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করেন— সঙ্কোচনেচ্ছু চিত্ত উৎপন্ন হলে হস্তা-পদাদির সঙ্কোচনরূপ ভৌতিক ক্রিয়া দেখা দেয় এবং প্রসারণেচ্ছু চিত্ত উৎপন্ন হলে প্রসারণরূপ ভৌতিক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এভাবে তিনি সকল ভৌতিক ক্রিয়ার হেতু অনুসরণ করতে থাকেন। অতঃপর তিনি নাম বা বেদনাদি চারি স্কন্ধের হেতু হৃদয়ঙ্গম করেন। মন যখন সাধনার বিষয় ছেড়ে বাইরের দিকে চলতে চায়, তখন তদনুরূপ অভিনিবেশ-চিত্ত উৎপন্ন হয়। এর ওপর লক্ষ্য না রাখলে মন বাইরের দিকে চলতে থাকে এবং সাধনা বিঘ্নিত হয়। যদি লক্ষ্য রেখে সতর্ক হওয়া যায়, তবে সেই অভিনিবেশচিত্ত বাধা পায় এবং মন বহির্মুখী হতে পারে না। এভাবে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে রূপ-শব্দাদি বিষয়ের সংস্পর্শে যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তা তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। তখন প্রায়ই যোগীর শরীরে নানারকম দুঃখানুভূতি জাগে। সে অনুভূতি সমূহের মধ্যে এক অনুভূতিকে লক্ষ্য করলে আর এক অনুভূতি অন্যত্র অনুভূতি হয়, তাকেও লক্ষ্য করলে অপরত্র অন্য অনুভূতির উদ্ভব হয়। তিনি এভাবে উৎপন্ন উৎপন্ন অনুভূতিকে

পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন এবং পর্যবেক্ষণের সময় এ অনুভূতিসমূহের উৎপত্তি বলে কথিত আদিভাগ মাত্র বুঝতে পারেন। কিন্তু এদের অবসাদ বা ভঙ্গ তাঁর অজ্ঞাত থাকে।

অতঃপর তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে রূপ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি বিষয় অনুসরণে চিত্তের উৎপত্তি হয় এবং বিষয়ের অবিদ্যমানে চিত্ত উৎপন্ন হয় না। পর্যবেক্ষণের অন্তরালে অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাঁর প্রতীতি হয়—অবিদ্যা, তৃষ্ণা কর্ম ইত্যাদি মূল কারণসমূহ বিদ্যমান আছে বলে এ নামরূপ প্রবর্তিত হচ্ছে। এভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানে নামরূপের হেতু পর্যবেক্ষণ করে জানার নাম প্রত্যয়পরিগ্রহ জ্ঞান বা হেতুপরীক্ষণ জ্ঞান। এ জ্ঞানের অনুশীলনে 'আমি কর্তা' 'আমি ভোক্তা' বলে আমিত্ববোধ শিথিল হতে থাকে, তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়—সমগ্র জগৎ হেতুও ফলের আবর্তনে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছে। অনুকূল হেতু সমূহের দ্বারা প্রবর্তমান নামরূপ দেখে তিনি উপলব্ধি করেন—এ নামরূপ হেতু সমূহের দ্বারা উদ্ভূত ও প্রবর্তিত; এর মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালক এবং সুখ-দুঃখাদির অনুভবকারী কোন ব্যক্তিবিশেষ নেই। এ উপলব্ধিতে 'আমি কি অতীতে ছিলাম?' 'আমি কি অতীতে ছিলাম না?' 'আমি কি ভবিষ্যতে থাকব?' 'আমি কি ভবিষ্যতে থাকব না?' 'আমি কি আছি?' আমি কি নেই?' 'আমি কোত্থেকে এলাম?' 'আমি কোথায় যাব?' ইত্যাদি কোন রকম সংশয় বা সন্দেহ মনে উদিত হয় না। একে বলা হয় কঙ্খাবিতরণ বিশুদ্ধি বা সংশয়োত্তরণ বিশুদ্ধি। সংশয় অধ্যাত্ম-সাধনার পথে চিরকাল বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করে দেয়। এতাদৃশ সংশয় অতিক্রম করার ফলে সাধকের অগ্রগতি হয় সচ্ছন্দ সাবলীল।

তিন

সংশয়োত্তরণ বিশুদ্ধি যখন আয়ত্ত হয়, যোগী পর্যবেক্ষিত বিষয়ের আদি, মধ্য ও অন্তভাগ বিশ্লেষণ করে হৃদয়ঙ্গম করেন। এ অবস্থায় গমনে তিনি লক্ষ্য করেন—পদোত্তোলন শেষ হলে পদহরণ, তার অবসানে পদনিক্ষেপ। এভাবে পূর্বক্রিয়ার অবসানে উত্তরক্রিয়ার উৎপত্তি তিনি অনুভব করেন। দুঃখানুভূতি সমূহের মধ্যেও একস্থানে প্রবর্তমান এক অনুভূতির অবসানে অন্যস্থানে অন্য এক অনুভূতি অনুভূত হয়। তাতে মনে অভিনিবিষ্ট করলে সেই অনুভূতিকে ধীরে ধীরে লঘু থেকে লঘুতর হয়ে বিগত হতে দেখা যায়। মনের গোচরীভূত বিষয়সমূহের মধ্যে পর্যবেক্ষিত এক একটি বিষয় বিগত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটির উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। এভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের নিরীক্ষণে প্রত্যেকটি অপরিস্ফুট হতে অপরিস্ফুটতর হয়ে অন্তর্হিত হতে দেখা যায়। এতে যোগী নিত্য ধ্রুব অক্ষয় কোন বস্তু খুঁজে পান না। এভাবে নিরীক্ষণের ফলে তিনি বিষয়ের ক্ষয়িষ্ণুতা লক্ষ্য করে বিষয়কে অনিত্য বলে দর্শন করেন এবং তা উৎপন্ন হয়ে ভেঙে যায় বলে দুঃখময় বলে ভাবেন অর্থাৎ বিষয়ের বিনাশ বা ধ্বংস ব্যথা হয়ে বাজে। আবার তিনি উপলব্ধি করেন—এগুলো ইচ্ছাধীন নয়, তাঁর ইচ্ছানুসারে এগুলোর প্রবর্তন হচ্ছে না, পরন্তু স্বাভাবিকভাবে এগুলো উৎপত্তি-ভঙ্গ নিয়মের অধীন। এজন্য এগুলোকে 'আমি' 'আমার' বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে তাঁর মনে হয় না। স্বতঃই এগুলো অনাত্ম বা অহংশূন্য প্রতিভাত হয়। এভাবে বিষয়সমূহের অনিত্যতা দুঃখময়তা এবং অহংভাবশূন্যতা প্রত্যক্ষভাবে অনুধ্যান করে জানার নাম সংমর্শন জ্ঞান বা যথাযথ মনন-সঞ্জাত জ্ঞান।

এ জ্ঞান আয়ত্ত করে যোগী জগতের সমস্ত নামরূপকে পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের মত ভঙ্গুর দুঃখপূর্ণ এবং অহংভাবশূন্য বলে চিন্তা করতে থাকেন। ভঙ্গুরতা, দুঃখপূর্ণতা এবং অহংভাবশূন্যতা বা অনাত্মতা সর্বস্থানের ও সর্বকালের নামরূপের প্রকৃতি বলে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়। একে বলা হয় অনুমান সংমর্শন জ্ঞান। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো উল্লেখযোগ্য :

সব্বে সংখারা অনিচ্চাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা,
সব্বে সংখারা দুক্খাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা,
সব্বে সংখারা অনত্তাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা।

অর্থাৎ যখন সমগ্র সৃষ্টি অনিতা বা ভঙ্গুর, দুঃখপূর্ণ ও অহংভাব শূন্য বলে প্রজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তখন দুঃখপূর্ণ সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না—এ হল বিশুদ্ধির পথ।

অনিতা-দুঃখ-অনাত্মবিষয়ক ধ্যান করতে করতে যোগী যখন বর্তমান নামরূপের অনিত্যতা দুঃখময়তা ও অনাত্মতা যুগপৎ প্রত্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন, তখন তাঁর বিদর্শনের প্রভাবে জ্যোতি প্রকাশ পায়। এ জ্যোতি কারু কাছে দীপালোকের মত এবং কারু কাছে বিদ্যুৎ চন্দ্রসূর্যাদির জ্যোতির মত প্রতিভাত হয়, আবার কারু কাছে ক্ষণস্থায়ী এবং কারু কাছে দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ অবস্থায় বিদর্শন সমন্বিত স্মৃতি তাঁর প্রখর হয়ে ওঠে। এর প্রভাবে উৎপন্ন নামরূপ তাঁর অনুশীলনপর চিত্তে আপনাপনি দেখা দেয়। সে নামরূপের মধ্যে তাঁর স্মৃতি যেন স্বভাবতঃই মগ্ন হয়ে পড়ে। তখন তাঁর অস্মরণীয় নামরূপ কিছু নেই বলে প্রতীতি জন্মে। প্রত্যবেক্ষণরূপ

বিদর্শন প্রজ্ঞান তীক্ষ্ণ হয়। এর প্রভাবে তিনি প্রত্যবেক্ষিত সমস্ত নামরূপ বিশ্লেষণ করে সুপরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। তখন তাঁর প্রত্যবেক্ষণ-শক্তির বহির্ভূত অর্থাৎ তিনি প্রত্যবেক্ষণ করতে পারেন না এমন কোন নামরূপ নেই বলে তাঁর ধারণা হয়। নামরূপের অনিত্যতাদি প্রকৃতি এবং অন্য স্বাভাবিকগুণসমূহ প্রত্যবেক্ষণ ক্ষণেই সুপরিস্ফুট হয়। এ তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে অনুভূতি জাগে, এ অবস্থায় তাঁর মনে বিদর্শনসমন্বিত গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। এতে মন সুপ্রসন্ন অনাবিল হয়ে ওঠে এবং বুদ্ধগুণাদি স্মরণে মনের মগ্নভাব বৃদ্ধি পায়। তখন লোককে ধর্মোপদেশ দান সৎকর্মে নিয়োগ ইত্যাদি ধর্মমূলক ক্রিয়াশীলতার দিকে তাঁর চিত্তের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রকমের প্রীতিতে হৃদয় প্লাবিত হতে থাকে। এ চিত্তবিশুদ্ধিক্ষণ থেকে লোমহর্ষণ দেহ-সঞ্চালন ইত্যাদি উৎপাদনে সমস্ত শরীরকে যেন স্নেহ-মধুর স্পর্শে বিভোল করে পরম সুখানুভূতি জাগে। এ পরম অনুভূতিতে যেন শরীর মৃত্তিকা থেকে উদ্‌গত হয়ে অনন্ত শূন্যে ভেসে চলেছে বলে মনে হয়। এ অবস্থায় দেহমনের সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত করে প্রশান্তি আসে। তখন শয়নে উপবেশনে গমনে স্থিতিতে এক কথায় সকল অবস্থায় দেহমনের ব্যথা বেদনা অবসাদ গ্লানি বলে কিছুই থাকে না। দেহমন প্রশান্ত পরমাশ্বস্ত সরল সক্রিয় হয়। শরীর যেন অন্তহীন সুখ-সমুদ্রে ভাসতে থাকে। তাতে তিনি নিজেকে পরম সুখী মনে করেন এবং অননুভূত সুখে মগ্ন বলে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। আপনার এ অপূর্ব ভাবান্তর লোকের নিকট ব্যক্ত করার জন্য ইচ্ছা জাগে। এ প্রশান্তি ও প্রীতি সম্বন্ধ উক্ত হয়েছে :

সুঞ্ঞাগারং পবিট্‌ঠস্‌স সন্তচিত্তস্‌স ভিক্‌খুনো
অমানুসী রতি হোতি সম্মা ধম্মং বিপস্‌সতো।

অর্থাৎ শূন্যাগার বা নির্জন গৃহে প্রবেশ করে শান্তচিত্ত ভিক্ষু বিদর্শন ভাবনায় রত হয়ে দিব্য আনন্দ অনুভব করেন।

চার

দিব্য আনন্দ অনুভব করতে করতে সাধনায় অগ্রগতির জন্য যোগীর বীর্য বা উদম শিথিলতা ও আধিক্য পরিহার করে সমভাবে প্রবর্তিত হয়। পূর্বে তাঁর প্রচেষ্টা কখনো শিথিলতার জন্য জড়তাগ্রস্ত কখনো আধিক্যদোষে বিক্ষিপ্তভাবগ্রস্ত হত বলে প্রকট বিষয় নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণে তিনি সমর্থ হতেন না এবং তাঁর জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কিন্তু এখন সুসমঞ্জস বীর্যের প্রভাবে দোষসমূহ অতিক্রম করে যথাপ্রকট বিষয় নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণে তাঁর সামর্থ্য লাভ হয় এবং জ্ঞান পরিস্ফুট হতে থাকে। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সমভাব সমন্বিত বিদর্শনসাম্য শক্তিশালী হয়ে প্রকট হয়। এ সাম্য অনুভূতির গুণে নামরূপের অনিত্যতাদি অনুধ্যানে সমভাবাপন্ন হয়ে নিরন্তর বর্তমান নামরূপ প্রত্যবেক্ষণ করতে পারেন। তখন বিনা চেষ্টায় এ প্রত্যবেক্ষণ যেন স্বভাবতঃই সম্পন্ন হয় এবং অভিনিবেশসাম্য প্রবল হয়ে ওঠে। তার ফলে ধ্যানের বিষয় চিন্তনক্ষণেই চিত্ত যেন দ্রুতবেগে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হয়ে নিবিষ্ট হয়।

পূর্বোক্ত জ্যোতিঃ ইত্যাদি গুণসমন্বিত ধ্যান উপভোগ করে যোগীর হৃদয়ে সূক্ষ্ম আসক্তির উদ্রেক হয়। তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক না হয়ে অথবা একে মনের মালিন্য বলে জানতে না পেরে লব্ধ ধ্যানসুখরূপে গ্রহণ করেন। তার আস্বাদনে তিনি নিজেকে ধ্যানসুখরত বলে ভাবেন। তাঁর জ্যোতিসমুজ্বল প্রীতিসুখোৎফুল্ল হৃদয়ে ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়। তাই তিনি ভাবেন—তিনি

অতীন্দ্রিয় মার্গফল বা নির্বাণোপলব্ধির বিশেষ স্তর লাভে ধন্য এবং তাঁর সাধনা সাফল্যমণ্ডিত, আর কোন কর্তব্য নেই। এরূপ ভ্রান্ত ধারণাকে সত্যদ্রষ্টার ভাষায় অমার্গে মার্গভ্রম বলা হয়। একে মনের উপক্লেশ বলে। অমার্গে মার্গভ্রম না হলেও জ্যোতি ইত্যাদির প্রতি যোগীর অনুরাগ জন্মে। এও বিদর্শন সাধনার উপক্লেশ মাত্র। তাই উপক্লেশসমূহের দ্বারা ক্লিষ্ট দ্রুত প্রবর্তমান প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান অপরিপক্ক উদয়ব্যয় জ্ঞান বলে অভিহিত হয়। এতে নামরূপের উদয়ব্যয় বা উৎপত্তি-বিলয় সুষ্ঠুভাবে জানা যায় না। কিন্তু প্রত্যবেক্ষণরত বিচক্ষণ যোগী অনুভব করেন— জ্যোতিঃ ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় সিদ্ধি নয়, এদের আস্বাদন বিদর্শন সাধনার বিঘ্ন মাত্র; যথা প্রকট ধ্যান বিষয়ের প্রত্যবেক্ষণই বিদর্শনের পথ। তিনি বুঝতে পারেন তার বিদর্শন সাধনা এখনও অসমাপ্ত, তাকে বিদর্শনরত হতে হবে। এভাবে নিজের বিচারশক্তির বলে অথবা গুরুর নির্দেশে নিজের সাধনা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান জন্মে। একে যোগীর পরিভাষায় মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শনবিশুদ্ধি বলে।

সাধনা সম্বন্ধে যথাযথভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারায় অথবা যথার্থ ধারণার ফলে জ্যোতিঃ ইত্যাদির প্রতি উদাসীন হয়ে তিনি ষড়েন্দ্রিয়দ্বারে যথাগত নামরূপ নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণ করেন। তাতে জ্যোতিঃ, প্রীতি, প্রশান্তি, সূক্ষ্ম অনুরাগ প্রভৃতি উপক্লেশসমূহ অতিক্রম করে উদব্যয় জ্ঞান তাঁর মধ্যে প্রবর্তিত হয়। তিনি প্রত্যবেক্ষণ করে দেখতে পান— গোচরীভূত বিষয় উৎপন্ন হয়ে বিলীন হচ্ছে, সে সে বিষয় সে সে স্থানে বিনষ্ট হচ্ছে। তিনি নামরূপের ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও বিলয় প্রত্যক্ষভাবে জেনে নিরন্তর উৎপত্তি-ভঙ্গ-পরায়ণ নামরূপ প্রত্যবেক্ষণ করতে থাকেন এবং অচিরেই তার উৎপত্তি ও ভঙ্গ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে

জানার জ্ঞান অর্জন করেন। তা উপক্লেশহীন উদয় ব্যয় জ্ঞান-দর্শন বলে কথিত হয়।

নামরূপের উৎপত্তি ও বিলয় প্রত্যক্ষভাবে নিরন্তরর নিরীক্ষণের ফলে যখন তাঁর উদয়ব্যয় জ্ঞান তীক্ষ্ণ, প্রবল এবং পরিপক্ক হয়, তখন তা অতিদ্রুতভাবে মনে উদিত হয় এবং নিরন্তর প্রবর্তিত হতে থাকে। নামরূপের ক্রিয়া অতিদ্রুত প্রতিভাত হয়। এ জ্ঞান আরও তীক্ষ্ণতর হলে এবং নামরূপের ক্রিয়া আরও দ্রুততর প্রতিভাত হলে প্রত্যবেক্ষিত নামরূপের উৎপত্তি, স্থিতি ও মধ্যভাগ কিংবা হস্তপদাদি অবয়ব দৃষ্ট হয় না, শুধু 'ক্ষয়' 'ব্যয়' 'ভঙ্গ' বলে উক্ত নিরোধই দৃষ্টিগোচর হয়। উদরের উন্নমন লক্ষ্য করলে সে উন্নমনের আদি মধ্য অথবা উদরাবয়ব প্রতিভাত হয় না, শুধু উন্নমনের অবসানই লক্ষ্যগোচর হয়। এভাবে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যক্ষের সমস্ত ক্রিয়ার ব্যাপারেও শুধু ক্রিয়াসমাপ্তিই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন প্রত্যবেক্ষিত নামরূপ সর্বতোভাবে অবিদ্যমান বলে প্রতিভাত হয়। এ অবিদ্যমানতার অন্তরালে শুধু নিরোধপরতা বা ক্ষয়শীলতা লক্ষ্য করে তাঁর প্রত্যবেক্ষণ-চিত্ত ধ্যান বিষয়ের সঙ্গে অযুক্ত মনে হয়। এজন্য বিদর্শন-ভঙ্গ হয়েছে বলে ভ্রম জন্মে। এ ভ্রম তিনি আত্মস্থ হয়ে বিদূরিত করেন।

পূর্বে তাঁর স্বাভাবিক চিত্ত আকার ইত্যাদি অবলম্বনে নির্বিষ্ট হত। এমন কি উদয়-ব্যয় জ্ঞান পর্যন্ত ধ্যাননিমিত্ত বা ধ্যানভূমিকা পরিলক্ষিত হওয়ায় তাঁর চিত্ত প্রকট বিষয়ে রত হত। কিন্তু এখন জ্ঞান পরিপক্ক হবার ফলে সংস্কারসমূহের বিগ্রহরূপ নিমিত্তও দৃষ্ট হয় না। স্থূলতর বস্তু দর্শনের কথাই বা কি? তেমনি বস্তুর উদয় দৃষ্ট হয় না, শুধু ভঙ্গই পরিলক্ষিত হয়। এতে তাঁর অনভ্যস্ত চিত্ত প্রথমতঃ রমিত হয় না। তবুও তাঁকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে

হবে—অভ্যাসের ফলে অচিরেই তাঁর চিত্ত ভঙ্গ বা নিরোধে রমিত হবেই। অতঃপর উত্তরোত্তর চেষ্টায় আপনার সাধনার এ নতুন স্তরে তাঁকে নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে।

নিরন্তরর চেষ্টায় মন যখন এতে অধিকার লাভ করে, তখন তাঁর প্রত্যবেক্ষিত বিষয় এবং তার অনুধাবনকারী চিত্ত অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ীদ্বয় ভঙ্গুর ক্ষয়শীল বলে প্রতিভাত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উন্নমনে মনে হয় যেন উন্নমনক্রিয়ায় উদ্ভূত রূপগুলি পরপর ভেঙে যাচ্ছে। সেই প্রত্যবেক্ষিত রূপসমূহের সঙ্গে প্রত্যবেক্ষণ-চিত্তেরও ভঙ্গ তিনি উপলব্ধি করেন। তখন তিনি শরীরের যে যে অংশ প্রত্যবেক্ষণ করেন, সে সে অংশের ক্ষয় লক্ষ্য করতে থাকেন। অতঃপর প্রতীতি হয় যেন প্রত্যবেক্ষণচিত্ত বিষয়ানুগমন করতে করতে নিরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই যে কোন গোচরীভূত বিষয় ও তদনুগামী চিত্তের ভঙ্গ যথাক্রমে পরিস্ফুটভাবে অনুভূত হয়। এভাবে ছয় দ্বারে যথাপ্রকট রূপশব্দাদি বিষয় এবং তদনুগামী চিত্ত এ দুয়ের ভঙ্গ সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তা ভঙ্গজ্ঞান বলে কথিত হয়।

এ ভঙ্গ-জ্ঞান পরিপক্ক হলে সকল বিষয় ও বিষয়ীভূত সংস্কার-সমূহের ভঙ্গ দেখে ক্রমশঃ ত্রিভবের প্রতি তাঁর ভয় বিরাগ ইত্যাদির উদয় হয়। তখন যথাপ্রকট বিষয় এবং তদনুগামী বিদর্শন-চিত্ত এ দুটির ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ দেখে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন—অতীতে দেহমন এবং সকল সংস্কার এমনিভাবে ভেঙেছিল, ভবিষ্যতে ভেঙে যাবে এবং এখন ভেঙে যাচ্ছে। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ফলে যথাপ্রকট বিষয় প্রত্যবেক্ষণকারী যোগীর সমস্ত সৃষ্টি ভয়সংকুল ভীতিপূর্ণ বলে মনে হয়। এভাবে ভয়ঙ্কর বলে জানাই ভয়োপলব্ধি। ভয়জ্ঞান এরই নামান্তর।

উক্ত ভয়জ্ঞানে সমস্ত ভয়সংকুল দেখে সৃষ্টির দোষ প্রতিভাত হয়। এতে প্রত্যবেক্ষিত বিষয়সমূহ, প্রত্যবেক্ষণ চিত্ত এবং সকল সংস্কার নীরস বিস্বাদ বলে মনে হয়। একে বলে আদীনবজ্ঞান।

সংস্কারসমূহের দোষ দেখে উপদ্রবপূর্ণ সংস্কারসমূহের প্রতি তাঁর চিত্ত অনুরক্ত হয় না। তিনি এগুলোর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁর চিত্ত উদাসীন ও নিরুদ্যম বলে প্রতিভাত হলেও তিনি বিদর্শন পরিত্যাগ করেন না। নিরন্তর বিদর্শনে তাঁর মন রত হয়। বস্তুতঃ উক্ত ঔদাসীন্য সাধনার প্রতি বিরাগভাব নয়, বরং সংস্কারসমূহের প্রতি বিরক্তভাবযুক্ত বিরক্তি জ্ঞান। তখন তাঁর মন কোন প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে রত হয় না, স্বাদ গ্রহণ করে না এবং স্বতঃই নির্বাণপ্রবণ নির্বাণপর হয়। তাই প্রত্যবেক্ষণের অন্তরালে তাঁর মনে জাগে—ক্ষয়ভঙ্গুর সংস্কারসমূহ থেকে নিষ্কৃতিই সুখ।

বিরাগভাগ নিয়ে প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে সংস্কারসমূহ থেকে বা সংসারাবর্তন থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়। তদ্‌প্রযুক্ত জ্ঞানকে মুমুক্ষাজ্ঞান বলে। তখন স্বতঃই মন হতে প্রার্থনা উত্থিত হয়—"আমি যেন শীঘ্রই মুক্তিলাভ করতে পারি, এ সংস্কারসমূহের অতীত নির্বাণে উপনীত হই।" প্রত্যবেক্ষণ সময়ে তাঁর প্রত্যবেক্ষণ চিত্ত যেন গোচরীভূত বিষয় থেকে পলায়নপর হয়ে ওঠে।

এ ভাবে মুক্তিকামী হয়ে তিনি মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ করে সংস্কারসমূহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন। তখন সংস্কারসমূহ ক্ষণভঙ্গুর দুঃখময় এবং অহংভাবশূন্য বলে প্রতীতি জন্মে। কিন্তু সংস্কারসমূহের দুঃখভাবই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় এবং বিবিধ দুঃখানুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে। তাই তার সমগ্র সত্তা বা নামরূপ দুঃখের খনি বলে

প্রতিভাত হয়। গমন, স্থিতি, শয়ন, উপবেশন কোন অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ থাকার অসামর্থ্যরূপ দুঃসহতা দেখা দেয়। নিরন্তর অবস্থানপরিবর্তনের ইচ্ছা জাগে। তা হলেও যোগীর অবস্থান পরিবর্তন বিধেয় নয়। উপবেশন, স্থিতি ইত্যাদি প্রত্যেক অবস্থানে অচঞ্চল হয়ে বিদর্শনরত হওয়া একান্ত উচিত। ধৈর্য্য সহকারে বিদর্শনরত হবার ফলে তিনি দুঃসহভাব অতিক্রম করেন। তখন বিদর্শন জ্ঞান তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। তাই তাঁর দুঃখানুভূতি লক্ষ্য করতে না করতেই মিলিয়ে যায়। সর্বতোভাবে মিলিয়ে না গেলেও ক্ষণে ক্ষণে তার অবসান প্রতিভাত হয়। নিরুদ্যম না হয়ে নিরন্তর লক্ষ্য করায় অচিরেই তা নিঃশেষে বিগত হয়। তখন তাঁর অনুভূতি উপশান্তভাব ধারণ করে। এভাবে বিদর্শনজ্ঞান প্রবল ও পরিস্ফুট হলেও যোগী আত্মপ্রসাদ লাভ করেন না। তাঁর বিদর্শন জ্ঞান পরিস্ফুট হয়নি বলে প্রতীতি জাগে। এ প্রতীতিও পরিত্যাগ করে নিরন্তর ধ্যানরত হতে হবে।

নিরন্তর বিদর্শনরত হবার ফলে যোগীর প্রত্যবেক্ষণ পরিস্ফুট হতে পরিস্ফুটতর হয়ে প্রবর্তিত হয়। তখন তিনি সকল দুঃখ-বেদনা, অবস্থান-দুঃসহতা ইত্যাদি অতিক্রম করেন। প্রত্যবেক্ষণও দ্রুততর হয়। তাতে 'অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম' এ ত্রিলক্ষণের অন্যতম পরিস্ফুটভাবে প্রতিভাত হয়। একেই বলে 'বলবা পটিসংখান ঞান' প্রবল প্রতিসংখ্যান জ্ঞান।

পাঁচ

পূর্বোক্ত প্রতিসংখ্যান জ্ঞান পরিপক্ক হলে যথাপ্রকট নাম রূপোৎপত্তিতে স্বতঃই তীক্ষ্ণগতিতে জ্ঞানস্ফুরণ হয়। তখন সংস্কার সমূহকে গোচরীভূত করবার জন্যে কিংবা জানবার জন্যে চেষ্টার

কোনো প্রয়োজন হয় না। এক একটি বিষয়ের প্রত্যবেক্ষণ শেষ হলে স্বতঃই প্রত্যবেক্ষণযোগ্য বিষয় গোচরীভূত হয় এবং প্রত্যবেক্ষণও উপলব্ধ হয়। যোগীর চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই বলে প্রতীতি জাগে। পূর্বে যেমন ভয়জ্ঞানের উৎপত্তি থেকে সংস্কারসমূহের ভঙ্গ দেখে ভীতি, বিরাগ, মুমুক্ষা (মুক্তি লাভের ইচ্ছা) উৎপন্ন হত, এখন তা আর হয় না। দুঃখবেদনা জাগলেও মনে বিষাদ আসে না, দুঃসহ মনে হয় না। তখন প্রায়ই যোগীর দুঃখবেদনা সর্বতোভাবে উপশমিত হয়ে যায়। ভীতিপ্রদ অথবা শোককর বিষয় চিন্তা করলেও ভয় কিংবা শোক জাগে না। এ বোধস্তরকে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান বলা হয়।

পূর্বে উদয়-ব্যয়ে জ্ঞানের উৎপত্তিতে বিদর্শনের পরিস্ফুটভাবের জন্য প্রবল আনন্দ জাগত। কিন্তু সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানে তা আরও পরিস্ফুটতর শান্ততর সূক্ষ্মতর হলেও মন স্পন্দনহীন হয়। আনন্দজনক বিষয় চিন্তা করেও তিনি প্রবল আনন্দে অভিভূত হন না। ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে মনের অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোন বিষয় গোচরীভূত হলে তার প্রতি অনুরাগ কিংবা বিরাগ তাঁর জাগে না। বিষয় সম্বন্ধে শুধু জ্ঞানমাত্রই জন্মে। এ হল সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের উপেক্ষণ প্রকৃতি।

বিদর্শন আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত বিদর্শনরত হয়। সেই থেকে যোগীর চেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় না। বিনা চেষ্টাতেও বিদর্শন অবিচ্ছিন্নভাবে দু তিন ঘণ্টা কাল ধরে প্রবর্তিত হয়। এভাবে বিদর্শন যখন স্বয়ংপ্রবর্ত হয়, তখন বাইরের কোন বিষয় তাঁর চিত্ত আকর্ষণ করে না। বাইরের বিষয়ের দিকে চিত্ত ধাবিত হলেও মুহূর্তকালের মধ্যেই ফিরে এসে প্রত্যবেক্ষিত বিষয়ে প্রবর্তিত হয়।

নানাগুণবিশিষ্ট উপেক্ষণ জ্ঞানে সংস্কারসমূহকে প্রত্যবেক্ষণ করার ফলে যখন সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পরিপক্ক তীক্ষ্ণ হয়ে চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন যথাপ্রকট সংস্কারসমূহের ভঙ্গদ্বয় অনিত্যতা, দুঃখ ও অনাত্মভাব সহজেই প্রতিভাত হয়। এ ত্রিলক্ষণের অন্যতম লক্ষণ পরিস্ফুটতম হয়ে প্রকাশ পায়। একে বলা হয় উত্থানগামী বিদর্শন। এ আয়ত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে যোগীর চিত্ত সকল সংস্কারের নিরোধ বলে কথিত নির্বাণের পানে অগ্রসর হয়। তখন সকল সংস্কারের অবসানসূচক উপশান্তি পরিদৃষ্ট হয়। এ স্থলে মিলিন্দ প্রশ্নের উক্তি উল্লেখযোগ্য—"তস্স তং চিত্তং অপরাপরং মনসিকরোতো পবত্তং সমতিক্কমিত্বা অপবত্তমনুপত্তো হোতি। অপবত্তমনুপত্তো মহারাজ সম্মা পটিপন্নো নিব্বানং সচ্ছিকরোতি।" অর্থাৎ ছয় দ্বারে প্রকট নামরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে যোগীর প্রত্যবেক্ষণ চিত্ত (নদীস্রোতের মত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তিত বলে) 'প্রবর্ত নামে উক্ত নামরূপ অতিক্রম করে অপ্রবর্ত বলে কথিত নামরূপাতীত জন্মমৃত্যুর পারে উপনীত হয়। তখন যোগী যথাযথভাবে আত্মনিয়োগ করে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

নির্বাণ সাক্ষাৎকারের জন্য উদ্যত যোগীর শেষ প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান নির্বাণানুকূল বলে অনুলোম জ্ঞান নামে কথিত হয়। তার অব্যবহিত পরে উৎপত্তি-বিলয়ের অতীত নির্বাণের ওপর প্রথম দৃষ্টিপাতের মত যে জ্ঞানোদয় হয়, তা প্রাকৃতজনের গোত্র বা স্তর অতিক্রম করে বলে গোত্রভু জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। অতঃপর জ্ঞান যখন নির্বাণস্থ নির্বাণময় হয়, তখন তাকে মার্গজ্ঞান বলে। এরই নামান্তর জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি এটিই নির্বাণোপলব্ধির প্রথম স্তর বা স্রোতাপত্তিমার্গ-লাভ। এ নির্বাণাবলম্বী জ্ঞানের অবসানভাগ

ফল-জ্ঞান বা স্রোতাপত্তি ফল নামে কথিত হয়। এর স্থিতিকাল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—একটি প্রত্যবেক্ষণ-চিত্তের প্রবর্তনের মত অতি সামান্যই। এর পরে প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মার্গ-প্রত্যবেক্ষণ এরই নামান্তর। নির্বাণময় ভাবে অবস্থিতির স্মরণ ফল-প্রত্যবেক্ষণ এবং সংস্কারসমূহের শূন্যতাবোধ নির্বাণ-প্রত্যবেক্ষণ নামে কথিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধিমার্গের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ প্রণিধানযোগ্য—

"ইমিনা বতাহং মগ্‌গেন আগতোতি মগ্গং পচ্চবেক্‌খতি, অযং মে আনিসংসো লদ্ধোতি ফলং পচ্চবেক্‌খতি, অযং মে ধম্মো আরম্মণতো পটিবিদ্ধোতি অমতং নিব্বানং পচ্চবেক্‌খতি।" অর্থাৎ এ মার্গের দ্বারা আমি নির্বাণোপলব্ধির স্তরে উপনীত হয়েছি (যোগী) প্রত্যবেক্ষণ করেন, এ অমৃতময় পরিণতি লাভ হয়েছে বলে ফল প্রত্যবেক্ষণ করেন, নির্বাণকে গোচরীভূত করেছি উপলব্ধি করেছি বলে নির্বাণামৃত প্রত্যবেক্ষণ করেন।

অতঃপর যোগীর যথাপ্রকট নামরূপ প্রত্যবেক্ষণে তা স্থূলভাবে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের স্তরে যেভাবে সূক্ষ্মরূপে প্রতিভাত হত, তা হয় না। উদয়ব্যয়জ্ঞানের পুনরুৎপত্তিই এর কারণ। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আর্য-পুদ্‌গল বা সত্যদ্রষ্টার বিদর্শনে প্রথমেই উদয়ব্যয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম। কোন কোন যোগীর পূর্বোক্ত মার্গফল জ্ঞান হতে উত্থানকালে মার্গফলানুসৃত অপরূপ শ্রদ্ধায় সুখে প্রীতিতে প্রশান্তিতে হৃদয় প্লাবিত হয়। তাঁর মগ্নভাব এত বৃদ্ধি পায় যে, কিছুই লক্ষ্য করবার অবসর থাকে না। স্বতঃই তাঁর মনে জাগে—'পূর্বে' কখনো এমন আনন্দ অনুভব করিনি।"

অবশেষে তিনি যখন প্রত্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন, তখন প্রথমেই উদয়ব্যয় জ্ঞান আসে। ক্রমশঃ সে জ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করে অচিরেই

•সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানে পরিণত হয়। তখন সমাধি পরিপূর্ণ না হলে এ জ্ঞান পুনঃপুনঃ প্রবর্তিত হতে থাকে। সমাধির পরিপূর্ণতায় আপনার নির্বাণোপলব্ধিকে উদ্দেশ করে বিদর্শনরত হলে স্রোতাপত্তি বা নির্বাণোপলব্ধির প্রথম স্তরের ফলচিত্ত ফলধ্যানরূপে নির্বাণোপগত হয়। এভাবে ফলধ্যানমগ্ন হওয়া, তাতে নৈপুণ্য লাভ এবং দীর্ঘ স্থিতি যোগীর একান্ত বাঞ্ছনীয়। এতে যখন সাফল্য আসে, তখন তাঁর লোকোত্তর সমাধি লাভ অত্যন্ত সহজ সুগম হয়। কেউ কেউ এ অবস্থায় গমনে ভোজনেও সমাধিস্থ হন। সমাধিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত নির্বাণমগ্ন হয়ে যায়।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, স্রোতাপত্তি বা নির্বাণোপলব্ধির প্রথম স্তর লাভের সঙ্গে সঙ্গেই অসত্যানুসরণ, দেহাত্মবোধ, সংশয় ইত্যাদি চিরতরে বিগত হয়। এতাদৃশ যোগীর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। আরও ঊর্ধ্বতর স্তর লাভ তাঁর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তাঁকে এজন্য নতুন করে ছয়দ্বারে প্রকট নামরূপের বিদর্শন আরম্ভ করতে হয়। এতে তিনি অনায়াসে নৈপুণ্য লাভ করে নিরন্তর চেষ্টায় সকদাগামিতা বলে উক্ত নির্বাণোপলব্ধির দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হন। তখন কামক্রোধের বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। অতঃপর যথাক্রমে অনাগামিতা ও অর্হত্ব বলে কথিত স্তরদ্বয় লাভের জন্য এ বিদর্শন পদ্ধতিই বিধেয়। তৃতীয় স্তর অনাগামিতা আয়ত্ত হলে কামক্রোধ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়। চতুর্থ স্তর অর্হত্বে উন্নীত হলে অবশিষ্ট ভববন্ধন—অহংভাব বা আমিত্ববোধ, ভবাসক্তি ও অবিদ্যা নিঃশেষে ছিন্ন হয়ে যায়। এ স্তরে উপনীত যোগী হন বন্ধনহীন শুদ্ধ মুক্ত পুরুষ। তাঁর নির্বাণোপলব্ধি হয় পরিপূর্ণ। এ অবস্থাই বিদর্শনযোগীর চরম লক্ষ্য, সাধনার শেষ, কর্তব্যের অবসান—নত্থি উত্তরি করণীয়ং।